স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব

আজ থেকে প্রায় ১৪৯ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব । এই কলকাতাতে জন্মালেন, হেদোর আশে পাশে কত খেলাধূলা করেছেন । স্কুলে গেলেন, কলেজে গেলেন, পড়াশুনা করেছেন -- অসাধারণ পড়াশুনা । প্রায় বিশ বছর আগে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার । অনেকবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি । তাঁর বাবা স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন । কোন বইয়ে নেই, তাঁর কথা কোথাও নেই । তিনি স্বামীজী সম্বন্ধে যেটুকু বাবার কাছে শুনেছেন, সে কথা বলতে বলতেই তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ত । স্বামীজীর ছাত্রজীবনের একদিনের কথা বলছেন -- স্বামীজীর মেধার কথা আমরা জানি, এরকম মেধা তো দেখা যায় না, অসাধারণ মেধা । কলেজের কোন পরীক্ষার আগের দিনের কথা । তখন গ্রীক হিস্ট্রির একখানা আলাদা বই ছিল । সেই বইটা স্বামীজীর ছিল না । কারোর থেকে এনেও তিনি পড়েন নি । যে দিন পরীক্ষা, তার আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় তালতলায় ঐ বন্ধুর বাড়ী গেছেন । যাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে বলছি, তাঁর বাবা তখন তালতলায় থাকেন । স্বামীজীরা একসঙ্গে পড়তেন । তাঁর কাছে গিয়ে বললেন ‘‘আমাকে তোর গ্রীক হিস্ট্রির বইখানা দে, ও তো আমার নেইও, পড়াও হয় নি । কালকে পরীক্ষা, রাত্রিবেলা পড়ে নেব ।’’ তিনি বললেন, ‘‘হ্যাঁ, তোকে দেব, কিন্তু তুই রাত্রে পড়ে নিয়ে ভোরবেলায় আমাকে দিস । কালকে পরীক্ষা, আমার তো একটু রিভাইস করতে হবে, একটু দেখা-টেখা তো দরকার ।’’ বললেন, ‘‘তুই ভাবিস নে, একটা লাল-নীল পেন্সিল কিনে আন ।’’ ঐ পেন্সিল আমাদের সময় ছিল, এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না । তিনি সেই বইখানি দিলেন আর একটা লাল-নীল পেন্সিল নিয়ে এলেন । স্বামীজী বললেন, ‘‘আমি কতগুলো জায়গায় নীলে দাগ দেব, কতগুলো জায়গায় লালে দাগ দেব । তোকে কালকে সকালে ৬টার মধ্যে বইখানা ফেরৎ দিয়ে যাব । তুই ঐ লাল আর নীলগুলো একটু চোখ বুলিয়ে নিবি, আর পড়তে হবে না ।’’ স্বামীজী বইখানা নিয়ে এলেন বাড়িতে, গৌরমোহন স্ট্রীটে । নিয়ে এসে বইখানি পড়ছেন, তাঁর মা বলছেন, ‘‘হ্যাঁ রে, তুই তো পড়ে পড়ে আজ যা করছিস ! খাচ্ছিস না, দাচ্ছিস না, ঘুমোচ্ছিস না, শরীরের কী অবস্থা হবে ? তুই খেয়ে নে, খেয়ে নিয়ে যত ইচ্ছে পড় ।’’ স্বামীজী বললেন, ‘‘না, আমি এখন পড়ছি, এখন হবে না ।’’ মা বললেন, ‘‘তুই না খেলে আমি খাব না ।’’ তখন বললেন, ‘‘তা হলে এখানে দিয়ে যাও।’’ একটা কানা-উঁচু থালায় রুটি আর ডাল স্বামীজীর মা স্বামীজীর পাশে দিয়ে গেলেন । বই পড়ছেন । সেই লাল-নীল পেন্সিল হাতে আছে । মা বললেন, ‘‘নে নে, তুই খা। তুই না খেলে আমি খাব না ।’’ মাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে উনি একটু রুটি ছিঁড়ে

ডালে ডুবোলেন । মা যখন দেখলেন রুটি ছিঁড়ে ডালে ডুবিয়েছে, তা হলে খাবে । তখন মা চলে গেলেন । কিন্তু তাঁর খাওয়া হল না । হাতটা তুলে নিলেন । হাতে ডাল লেগেছিল, আর সেই হাত দিয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন । ঐ বইটার পাতার কোণাগুলো ডাল লেগে হলদে হয়ে গেছিল । ভদ্রলোক বললেন, ''বহু বছর পর্যন্ত বইখানা বাড়িতে রাখা ছিল । কিন্তু তারপরে আমার মামা একবার এসে জোর করে বইটা নিয়ে গেলেন । কাজেই সেই বইটা আর দেখতে পাই না ।''

স্বামীজী বিদেশে গেছেন, বিশ্ব জয় করে এসেছেন, তারপরেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল । বেলুড় মঠ স্থাপন হয়েছে । তখন রানীগঞ্জে একটি চাকরী করতেন সেই বন্ধুটি । তিনি শনিবার রানীগঞ্জ থেকে চলে এসে বেলুড় মঠে থাকতেন, স্বামীজীর কাছাকাছি । আবার সোমবার সকালে বা রবিবার রাত্রে চলে যেতেন । একদিনের গল্প বলছেন, ''এসেছি, এসে কথায় কথায় কিছুক্ষণ কাটল। তারপর স্বামীজী গান গাইছেন, 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর'। গাইতে গাইতে স্বামীজীর সমাধি হয়ে গেছে । সমাধি হয়ে গিয়ে তানপুরাটি হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে ।'' ওঁর বন্ধুটি তানপুরা সরিয়ে রেখে দিলেন । এমন সমাধি বসে বসে, গায়ে মাছি বসছে, হুঁশ নেই । বন্ধু একটি পাখা যোগাড় করে স্বামীজীকে বাতাস করছেন । খানিক্ষণ পরে স্বামীজী স্বাভাবিক হলেন । বন্ধু স্বামীজীকে 'নারু' বলতেন । নরেন থেকে হয়তো নারু করেছিলেন । ''নারু, আর আসবো না তোর কাছে । কোথা থেকে আসি তোর সঙ্গে একটুখানি গল্প করব, গান হবে, এই আশায় । তা নয়, সমাধি হয়ে বসে রইল ! আর তোর কাছে আসব না ।'' স্বামীজী তখন বলছেন, ''না না, রাগ করিস নে, রাগ করিস নে । কি হবে ? কি করব বল ।''

গিরিশচন্দ্র ঘোষ একদিন বলছেন -- তাঁর বাড়ীর ছাদে বসে এই গানটির কথা উঠেছে -- ''যার সে অনুভূতি না হয়, সে কি এ গান গাইতে পারে ?''

''বহে মাত্র 'আমি' 'আমি' -- এই ধারা অনুক্ষণ ।।
সে ধারাও বদ্ধ হ'ল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্মনসোগোচরম্', বোঝে -- প্রাণ বোঝে যার ।।''

যার প্রাণ বোঝে, সেই বোঝে ।

সেই নরেন, ছেলেমানুষ নরেন, এই কলকাতায় ঘুরে ফিরে বেরিয়ে আস্তে আস্তে লেখাপড়া করলেন । কি অনুভূতি, কি মেধা ! স্কটিশচার্চ কলেজে প্রফেসার হেস্টির কাছে ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়তে গিয়ে ট্রান্সের কথা হল -- যেটা হল ভাবসমাধির মত অবস্থা । তিনি বললেন, ''এটি না দেখলে বোঝা যায় না। একটি লোক দেখেছি, দক্ষিণেশ্বরে থাকেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস । তাঁর ট্রান্স হয়। তাঁকে দেখলে এটি কি জিনিস বোঝা যায় ।''
তখন অবশ্য যান নি । আরও পরে ঘটনাক্রমে গেছিলেন । তার পরের ঘটনা সকলের জানা ।

নরেন্দ্রনাথ শুধু যে খুব ডানপিটে ছেলে ছিলেন, তা নয়, খেলাধূলায় খুব ভালো ছিলেন । স্বামীজী তখন মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে আসা যাওয়া করেন, আবার বাড়ীতে ফিরে যান । এরকম তখন অনেকেই ছিল, অনেকদিন পর্যন্ত । এমন কি বরানগর মঠ হওয়ার পরেও এরকম চলত । একবার বাড়ীতে গেছেন, অন্য দু-চারজন ঠাকুরের সন্তানও ওখানে গেছেন । গিয়ে বলছেন, ''নরেন আজকাল খালি বেদান্ত বেদান্তই করছে, আগে যে সব শারীরিক নানা রকম পারতো, সে সব আর পারে না ।'' বললেন, ''কি পারি না ? কি কি চাস ?'' ''পিকক করতে পারবি?'' তো স্বামীজী পিকক করতে লাগলেন । মানে হাতের ওপরে ভর করে পা ওপরে থাকবে । এই করে ওই বাড়ীতে এক ঘন্টা ঘুরেছিলেন, বেদান্ত আলোচনা করেছিলেন পিকক করে । স্বামীজীর কথা বলা যায় না । স্বামীজীর কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে উপনিষদের সেই কথাটা মনে হয় -- ''নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ ।'' (কেনোপনিষৎ, ২।২) বলতে পারি না যে তাঁকে বুঝে ফেলেছি, আবার এও বলতে পারি না যে কিছু জানি না । ভাগবতে আছে, পৃথিবী-পৃষ্ঠে যত ধূলিকণা আছে, চেষ্টা করলে বোধ হয় তা গুণে ফেলা যায়, কিন্তু এরকম শক্তিমান পুরুষের গুণ বলে শেষ করা যায় না । আমাদের স্বামীজীকে দেখা অন্ধ-হস্তি-দর্শন-ন্যায় । ঠাকুর গল্প বলতেন না ? -- কয়েকটি অন্ধ গেছিল হাতি কিরকম দেখবার জন্য । কেউ পায়ে হাত দিয়েছে ; সে বললে, থামের মতন । কেউ কানে হাত দিয়েছে ; সে বললে, কুলোর মতন । কেউ পেটে হাত দিয়েছে ; সে বলল, জালার মতন । হাতি যে কেমন, অন্ধেরা বুঝল না । যে যেটুকু দেখছে, সে সেটুকু বুঝল । আমাদের স্বামীজীকে দেখা, ঠাকুরকে দেখা, মাকে দেখা ঐরকম । আমরা যে যেটুকু দেখছি, মনে করলুম বুঝে ফেলেছি । ''ও আর কি ? এবার লোককে বুঝিয়ে দেব।'' এঁদের বোঝা সম্ভব নয় । তবে হ্যাঁ, যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকু যদি জীবনে কাজে লাগানো যায়, তা হলে ধন্য হয়ে যাবে জীবন ।

স্বামীজী কী রকম মানুষ ? শ্রদ্ধা, পবিত্রতা, বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম আর বিশেষ করে সর্বমুক্তিকামনার ঘনীভূত মূর্তি, জীবন্ত বিগ্রহ । পবিত্রতার মূর্তি, শ্রদ্ধার মূর্তি । স্বামীজী বলছেন, মানুষে মানুষে ভেদ কিসে ? শ্রদ্ধার তারতম্যে । গীতায় আছে, ''শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।।'' (১৭।৩) শিবসংহিতায়ও আছে, যার যেমন শ্রদ্ধা, তার তেমন প্রাপ্তি । স্বামীজীর মধ্যে সেই শ্রদ্ধা অসাধারণ । শ্রদ্ধার আসল মানে আস্তিক্য বুদ্ধি । সেই বস্তু আছে এবং আমিও সেই বস্তু -- এই আস্তিক্য বুদ্ধি । যার আস্তিক্য বুদ্ধি আছে, সেই আস্তিক । এটাকে সাধারণ কথায় আমরা আত্মবিশ্বাস বলি, মানে নিজের ওপর বিশ্বাস । আসল মানে হল, আত্মায় বিশ্বাস -- এই বিশ্বাস যে তিনি আমার মধ্যে আছেন । স্বামীজীর মধ্যে এই শ্রদ্ধা অসাধারণ, স্বামীজীর পবিত্রতা অসাধারণ, বিবেক অসাধারণ ।

অসাধারণ বিবেক । সেই জন্য অনেককাল পরে নাম বদলে বদলে শেষ অবধি বিবেকানন্দ নামটি তিনি নিয়েছিলেন, যখন আমেরিকায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত হল । এ নিয়ে অনেক রকম বলা আছে এ বই ও বই সে বইতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেটা পাওয়া যায় -- তিনি নিজে বম্বেতে গিয়ে জাহাজের টিকিট কেটেছিলেন এবং নিজে সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ নাম দিয়েছিলেন । ঐ অমুক মহারাজা নাম দিয়েছেন, এসব কোনও কাজের কথা নয় । স্বামীজী গুরুভাইদের সকলের নাম দিয়েছেন, আর স্বামীজীর নিজের নামটি আর একজন কেউ দিয়ে দেবে ? কালী মহারাজকে স্বামী অভেদানন্দ নাম তিনি দিয়েছেন, রাখালকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নাম তিনি দিয়েছেন ঠাকুরের হয়ে, আর তাঁর নামটি বিবেকানন্দ হবে এইভাবে ?

অনেক সময় ছেলেরা প্রশ্ন করে, বিবেকানন্দ মানে কি ? আনন্দ কে না চায়? কেউ নিরানন্দ খোঁজে না । কেউ বলে, ঈশ্বরকে চাই । কেউ বলে, এটা চাই, ওটা চাই । সব কিন্তু হচ্ছে আনন্দের খোঁজে । কিন্তু এমনি আনন্দ যদি খুঁজতে যাই, তা হলে অনেক সময় সেই আনন্দটা নিরানন্দে পরিণত হয় । একটি উপায় আছে, যা করলে আনন্দ কখনও নিরানন্দে পরিণত হয় না, বরঞ্চ আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে । সেটি হচ্ছে বিবেক । বিবেক ব্যবহার করে যদি চলে, আনন্দ নষ্ট হয় না । বিবেকানন্দের নামের মধ্যে এই ভাবটি আছে ।

ব্যাসদেব পতঞ্জলির যোগসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছিলেন বলে প্রচলিত আছে । ব্যাসদেবের সমস্ত রচনার ভাষ্য করেছেন শঙ্করাদি আচার্যেরা । কিন্তু ব্যাসদেব এই একটি মাত্র শাস্ত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন বলে প্রচলিত আছে । আর স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু পতঞ্জলির যোগসূত্রের ভাষ্যই রচনা করেছিলেন । ভাষ্য রচনাই বলতে হবে -- তিনি রাজযোগের ক্লাসে যা বলেছেন, সেটা ভাষ্যই হয়েছে । কারণ এই সব প্রাচীন আচার্য, যাঁরা ভাষ্যকার ছিলেন, তিনি তাঁদের থেকে কম নন । তাঁর ভাষ্যের ক্ষমতা কি রকম, সেটি গীতার একটিমাত্র শ্লোকের ভাষ্য রচনা করে স্বামীজী দেখিয়ে দিয়েছেন :

‘‘যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ।।’’ (২।৪৬)

এর ওপর শঙ্করের ভাষ্য আছে, স্বামীজীর ভাষ্যও আছে । পাশাপাশি পড়ে দেখুন, সাধারণ বুদ্ধি কি বলে । স্বামীজীর ভাষ্য শঙ্করের ভাষ্যের চেয়ে অনেক বেশী উপাদেয়, যদিও সেখানে স্বামীজী বলছেন, ‘‘শঙ্করের ব্যাখ্যাই অনুসরণীয়।’’ শঙ্করই গ্রহণীয় বটে, তবে এরকমও বলা যায় -- স্বামীজী যে আর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না । সেই স্বামীজী কিন্তু ঐ যোগসূত্রেরও ভাষ্য রচনা করেছেন । ব্যাসের ভাষ্য বলে যেটি প্রচলিত আছে, তাতে ‘‘অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ’’ (১।১২) - এই সূত্রটির ভাষ্যতে ব্যাস বলছেন - ‘‘চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী, বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ । যা তু কৈবল্য-প্রাগ্‌ভারা বিবেকনিম্ননিম্না সা

কল্যাণবহা, যা সংসার-প্রাগ্‌ভারা অবিবেকনিম্ননিম্না সা পাপবাহা । তত্র বৈরাগ্যেন সংসারস্রোতঃ ক্রিয়তে বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেকস্রোত উদ্‌ঘাটতে'' - সেই কবে ব্যাসদেব বলে গেছেন, চিত্তনদী অর্থাৎ আমাদের মন নদীর মতন, যার যেন দুটি প্রবাহ আছে । যেমন আমাদের পদ্মা আর গঙ্গা দুটি প্রবাহ হয়েছে, ঐরকম যেন চিত্তনদীর দুটি প্রবাহ আছে । একটি কল্যাণবহা, একটি পাপবহা -- একটি কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়, একটি পাপের দিকে নিয়ে যায় । কল্যাণের দিকে যেটি নিয়ে যায়, তার তলদেশটা হচ্ছে বিবেক দ্বারা নির্মিত, আর পাপের দিকে যেটি নিয়ে যায়, তার তলদেশটা অবিবেক দ্বারা নির্মিত । বিবেকের ওপর দিয়ে যে ধারা প্রবাহিত হয়, তা কল্যাণের দিকে দিয়ে যায় । বিবেক-বিবেচনাহীন হয়ে, বিচার না করে যে কাজ করা হয়, সেটা আমাদের পাপের দিকে নিয়ে যায় । সংসারের দিকে, পাপের দিকে যে প্রবাহটি নিয়ে যায়, তাকে বন্ধ করতে হবে কি করে ? বৈরাগ্যের দ্বারা -- একটু একটু ছাড়া, একটু একটু ছাড়া । এই যে আমরা কামনা বাসনা নিয়ে জড়িয়ে আছি, এগুলো একটু ছাড়া । এগুলো একটু ছাড়লে সেই স্রোতটা বন্ধ হয়ে যাবে -- ''বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেকস্রোতঃ উদ্‌ঘাটতে'' । বিবেকের স্রোতটি খুলে দাও । স্বামীজীর কথাই বলা হয়েছে । আমরা যদি বিবেক-দর্শনের অভ্যাস করি, তা হলে পাপের দিকে কখনও যেতে পারব না । মনের কল্যাণ প্রবাহ ধরে আমরা সেই কৈবল্যের দিকেই যাব, মুক্তির দিকে, উন্নতির দিকেই যাব, ভাল হবার দিকেই যাব।

ঠাকুরের কাছে এসে পড়লেন ১৮ বছর বয়সে । প্রথম দিন তো সেই সুরেন মিত্রের বাড়ীতে গান গাইবার লোকের অভাব হওয়াতে তাঁকে নিয়ে গিয়ে গান গাইতে বলা হয়েছিল । উনি দুটি গান গেয়েছিলেন । কিন্তু সেই অবসরেই ঠাকুর তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর দেহের লক্ষণাদি দেখে নিলেন । তাতেই হল -- ''একদিন দক্ষিণেশ্বরে এস ।'' একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলেন । দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে সেই প্রথম দিনেই কি হয়েছিল, অনেকেরই জানা আছে । কিন্তু আমাদের খানিকটা বোঝা, খানিকটা না বোঝা । সব ঠিক ঠিক বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই । আমরা অনেকে মনে করি যে, স্বামীজী নিজেও যেমন বলছেন, ঠাকুর পথের ধূলি থেকে হাজার বিবেকানন্দ তৈরী করতে পারতেন । আমরা অনেকে হয়তো মনে করি, ঠাকুর নরেনকে কলকাতার পথের ধূলি থেকে তুলে এনে 'বিবেকানন্দ' তৈরী করেছেন । বোধ হয় ঘটনাটা তা নয় -- এ বড় গম্ভীর জিনিস । স্বামীজীর আবির্ভাব বড় গম্ভীর জিনিস । স্বামীজী ছিলেন এবং এখনও আছেন -- এই মহাকল্পের আদি থেকে । মানে বিশ্বব্রহ্মান্ড যখন সৃষ্টি হয়েছিল, তখন থেকে আছেন, এখনও আছেন । তিনি কোথা থেকে এসেছেন, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর সেদিন বলেছিলেন । তাঁকে বারান্দায় একলা ডেকে নিয়ে গিয়ে হাত জোড় করে বলেছিলেন, ''জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে আবার শরীর ধারণ

করেছ।'' নরেন তো হতভম্ব । ভাবলেন, ''বলে কি ! বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে আমি, আমাকে বলে কিনা পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ ! ব্যাপারটা কী ?''

একেবারে ঠিক ধারণা নিয়ে বিচার করে বোঝাবার চেষ্টা করলে তবেই এগুলো বোঝা যাবে । কাহিনী আছে, ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করলেন । জগৎ সৃষ্টির পরে সাতজন মহর্ষি সৃষ্টি করলেন, যাতে তাদের মাধ্যমে জগতে আরও মানুষ জন্মায় এবং তাদের রক্ষণ হয় -- প্রকৃতিমার্গের মধ্যে দিয়ে, ভোগের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু বহু পুরাণে অন্য চারজন ঋষির কথা আছে, নানান রকমের নামের তফাৎও আছে । বেশীর ভাগ জায়গায় বলা হয়েছে, ওদের মহর্ষি বলা হয়, এদের চারজনকে ব্রহ্মর্ষি বলা হয় । স্বামীজী সপ্তর্ষি মন্ডল থেকে এসেছেন, একথাটা খুব প্রচলিত, কিন্তু সপ্তর্ষি মন্ডল বললে আমরা যে আকাশের সাতটি নক্ষত্র মনে করি, একেবারেই তা নয় । ঐ সাতটি নক্ষত্রের যে সাতটি ঋষির নাম আছে, তাঁরা হচ্ছেন ঐ মহর্ষি, যাঁরা প্রবৃত্তি মার্গের ঋষি । একেবারেই তাঁদের থেকে স্বামীজী আসেন নি । অত্যন্ত অনুচিত কথা। মহর্ষি সৃষ্টির পরে আবার সনকসনন্দাদি কয়েকজন ব্রহ্মর্ষি সৃষ্টি করলেন, যাঁরা জগতে নিবৃত্তি মার্গ প্রচার করবেন -- ''ততঃ অন্যান্ চ সনকসনন্দমাদিঃ উৎপাদয় নিবৃত্তিলক্ষণং ধর্মং প্রহায়মাস'' । তাঁদের মধ্যে স্বামীজী একজন ।

এক এক পুরাণে এক এক রকম আছে । এখন মজাটি হচ্ছে, প্রায় সব জায়গায় কিন্তু বলা আছে, এই ব্রহ্মর্ষিরা আগে সৃষ্টি হয়েছিলেন । সব পুরাণে আছে, ভাগবতেও পরিষ্কার বলা আছে । কিন্তু পরে শঙ্করাচার্য যেটা করেছেন, সেটি একমাত্র মহাভারতে আছে । মহাভারতের মতে, মহর্ষিরা তৈরী হয়েছেন আগে এবং ব্রহ্মর্ষিরা তৈরী হয়েছেন পরে । ভাগবতে একেবারে সাংঘাতিক কান্ড বলা আছে : আগে ব্রহ্মর্ষিরা তৈরী হলেন । তাঁদের ব্রহ্মা বললেন, তোমরা প্রজাপতি হয়ে লোক সৃষ্টি কর । তাঁরা এমন ক্ষেপে উঠলেন যে, একেবারে ব্রহ্মার সঙ্গে ভয়ানক ঝগড়াঝাঁটি মারামারি হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হল । বললেন, ''না, তোমার কথা শুনব না । আমরা করতে পারব না, আমরা এসবের মধ্যে নেই । আমরা বৈরাগ্য নিয়ে থাকব।'' এরকম ভাগবতে আছে, অন্যান্য জায়গাতেও আছে ।

আবার বাভন পুরাণে আবার আছে যে, ভগবান আগে ধর্ম সৃষ্টি করলেন । এটি উপনিষদেও আছে । ''তৎস্রেও রূপম অতম সজাত ধর্মম'' -- তখন স্রষ্টা ভগবান একটি অপূর্ব জিনিস সৃষ্টি করলেন -- তার নাম হল ধর্ম । সেই ধর্মের স্ত্রীর নাম অহিংসা । ধর্ম অহিংসাকে বিবাহ করলেন এবং এঁদের সন্তান হলেন এই ঋষিরা। কি অপূর্ব ! সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, প্রভৃতি -- এঁরা হচ্ছেন সাতজন ব্রহ্মর্ষি । আবার চারজন ব্রহ্মর্ষির কথাও শাস্ত্রে আছে । ঠাকুর কিন্তু দুরকমই বলছেন । তিনি নরেনকে চারজনের একজনও বলছেন, আবার সাত ঋষির একজনও বলছেন ।

তাঁকে কোথা থেকে এনেছেন বলতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন : এই পৃথিবী ছেড়ে, জগৎ ছেড়ে মন উঠে যাচ্ছে । আকাশে গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য এসব পেছনে পড়ে রইল । দেবতারা পড়ে রইলেন পেছনে, খন্ডের ঘর সম্পূর্ণ পেরিয়ে গেল, তারপরে আলোকময় একটি বেড়ার মতন । সেটি পার হয়ে অখন্ডের ঘরে পৌঁছলেন । অখন্ডের ঘরে পৌঁছে দেখলেন, সেখানে কোন মূর্তি নেই । স্বামীজীকে যেখান থেকে এনেছেন বলে ঠাকুর বলেছেন, সেটি হচ্ছে -- শুধু ব্রহ্মলোক নয়, ব্রহ্মলোকেরও তিনটি ধাপ আছে : জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক । স্বামীজীর সম্বন্ধে ঠাকুর যা যা বলেছেন, মিলিয়ে দেখে অনেকে অনেক মত দিয়েছেন -- জনলোকে ছিলেন, না তপোলোকে ছিলেন, না সত্যলোকে ছিলেন । জনলোক, সত্যলোকে ছিলেন না স্বামীজী । কারণ যেখানে ছিলেন, সেখানে তাঁদের কোন নিকেতন থাকে না, দেহবোধ থাকে না এবং তাঁরা কি ধ্যান করেন, বর্ণনা আছে । ''ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ'' (৩।২৭) -- সূর্যে সংযম করলে সমগ্র ভুবনের জ্ঞান হয়, এই যোগসূত্রের ব্যাসদেবকৃত ভাষ্যে একেবারে বিস্তৃতভাবে বলা আছে । সেখানে বলছেন, তাঁরা আস্মিতা মাত্র ধ্যান করেন । ঐ যে অবস্থায় স্বামীজী ছিলেন, সেখানে কোনও আকার নেই, দ্বৈত কিছুই নেই, আছে শুধু অস্মিকামাত্র ধ্যান । তাঁদের আহার হচ্ছে শুধু ধ্যান, ধ্যানাহার করে সেইখানে আছেন । সেইখানে ঠাকুর গিয়ে দেখছেন । প্রথমে দেখা গেল না কোন আকার । ধীরে ধীরে দেখলেন, মনে হল যেন সাতজন বসে ধ্যান করছেন । আর সেইখানে বলা আছে, সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ থেকে আস্তে আস্তে যেন একটি শিশু এল সেখানে । এসে কোমল বাহু দিয়ে ঐ সাতজনের মধ্যে অন্যতম একজনকে আলিঙ্গন করে তাঁকে সমাধি থেকে উত্থিত করবার চেষ্টা করল । ঠাকুরের বলা কথার মধ্যে যেটা খুব বেশি লক্ষ্য করবার, সেটা হচ্ছে, তিনি স্মিতহাস্যে এমন ভাব করলেন, মনে হল এই শিশুটিকে ঐ ঋষি অনেককাল চেনেন। এটা কিন্তু আমরা প্রায়ই মানে রাখি না । শিশুটি আস্তে আস্তে বলল, ''আমি যাচ্ছি, তুমি এসো ।'' কিন্তু ঐ ঋষি চোখটি সামান্য খুলে ঐ শিশুটিকে এমনভাবে দেখলেন, ঠাকুরের মনে হল, যেন তিনি কতকালের চেনা । এই ঋষিদের সৃষ্টি করেছিলেন কে ? ভগবান বলি, সোজা কথায় সে তো ঠাকুরই । ঠাকুরই তো জগৎ সৃষ্টি করে জগতের রক্ষার জন্য এই মহর্ষি আর ব্রহ্মর্ষিদের সৃষ্টি করেছিলেন । কাজেই সেই ঋষি যখন ধ্যান অবস্থা থেকে একটু উত্থিত হয়েছেন, তখন তিনি স্মিতহাস্যে ঠাকুরকে দেখছেন । অনেকদিনের চেনা বলে তাঁর মনে হবেই । ''খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু'' -- সেই যে শিশু কিন্তু স্বামীজীকে নিয়ে এলেন।

যে ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন, তিনি হচ্ছেন ঐ সপ্তব্রহ্মর্ষির মধ্যে সনাতন। আর তারই আর এক নাম হচ্ছে নারায়ণ । নর আর নারায়ণ এই দুজনের কথা একমাত্র ভাগবতে আর দেবী ভাগবতে আছে । সেখানে কিন্তু গল্প সম্পূর্ণ অন্য রকমের । সেখানে আছে যে, ধর্ম সৃষ্টি করলেন চারজনকে -- বিষ্ণু, কৃষ্ণ, নর আর

নারায়ণ । বিষ্ণু আর কৃষ্ণ শুধু ধ্যান করতে লাগলেন বসে বসে । নর আর নারায়ণ পৃথিবীতে এলেন বদ্রিকাশ্রমে, এক সহস্র বর্ষ শুধুমাত্র গায়ত্রী জপ করতে লাগলেন । তখন কি কান্ড হল -- ইন্দ্র নিজে এলেন নানান রকম প্রলোভন দেখাতে, তাঁদের ধ্যান ভেঙে দেবেন বলে । কিছুই করতে পারলেন না ।

কাজেই ঠাকুরের কাছে এখানে এসে ম্যাজিকে বিবেকানন্দ হয়ে গেলেন, তা নয় । যখন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই আধারটি ঠাকুর দেখে রেখে দিয়েছিলেন । এই মহাকল্পের সৃষ্টির সময় ঠাকুর ঐ ঋষিদের তৈরী করে রেখেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে থেকে নারায়ণ ঋষিকে নিয়ে এলেন । সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, ''নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করবার জন্য আবার শরীর ধারণ করেছ ।'' তারপরে যদি আমরা স্বামীজীর জীবনটি দেখি, স্বামীজীর বানী দেখি, বুঝতে পারব যে, এই কাজ এইরকম না হলে সম্ভব নয় ।

এখানে প্রথমে যেটুকু বলা হচ্ছিল, তার মধ্যেও স্বামীজীর শিক্ষার মূল কথাগুলি এসেছে । স্বামীজীর মূল কথা হচ্ছে -- আমরা শঙ্করাচার্যের কথার যেদিকটায় জোর দিই না, সেদিকটায় জোর দিতে হবে । ''ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা'' সবাই বলেন, কিন্তু এরপর আছে -- ''জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ''। এটার ওপরে স্বামীজী জোর দিয়েছেন । ''ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা'' তো বটেই । কিন্তু প্রচলিত অর্থে 'বটে'ও বলেন নি । ঠাকুরও বলেন নি, স্বামীজীও বলেন নি । একবার জিজ্ঞেস করা হলে স্বামীজী বলছেন, "What Ramakrishna Paramahamsa and I have added to this is, that the Many and the One are the same Reality, perceived by the same mind at different times and in different attitudes." সব ঠাকুরের কথাই । তিনি বলেছেন যে, এক এবং বহু -- দুটোই সত্য, দুটি দুভাবে দেখার জন্য । সেজন্যই ঠাকুর জ্ঞান আর তার পরে বিজ্ঞানের কথা বলেছিলেন । স্বামীজী সেই জন্য being এর সঙ্গে becoming বলেছেন । এক জিনিস । তিনি এক, কিন্তু তিনিই সব হয়েছেন । ''আজিবাঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ'' (মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব) - শঙ্করাচার্য গীতাভাষ্যে উদ্ধার করেছেন । এই বিশ্বব্রহ্মান্ডটা হচ্ছে সনাতন ব্রহ্মবৃক্ষ, এখানে সকলে চিরকাল বাস করছে । এটা শঙ্করাচার্য অন্যত্রও বলেছেন,

''দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেদ্ ব্রহ্মময়ং জগৎ ।
সা দৃষ্টি পরমোদারা ন নাসাগ্রাবলোকিনী ।।''

আমরা সব বলি জপ করছি, ধ্যান করছি, নাসাগ্রে আমাদের দৃষ্টি একাগ্র করছি -- উপহাস করছেন শঙ্করাচার্য । নাকের ডগার দিকে চেয়ে থাকা নয়, এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ । স্বামীজী এই কথাটিই শোনাতে এসেছিলেন । মানুষের সেবা করা নয়, স্বামীজী বলছেন । আমরা স্বামীজী পড়ি না সেভাবে । স্বামীজী বলছেন এক জায়গায়, অধ্যাপক থেকে আরম্ভ করে বাচ্চা ছেলে পর্যন্ত বলে, মানুষের সেবা কর । আর

এখন অনেকের ধারণা হচ্ছে, মাদার টারিজা এসে ভারচবর্ষে মানুষের সেবা শেখালেন। তা তো নয় । ভাগবতে কি কথা রয়েছে :

''অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ং ।
অর্হয়েৎ দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ।।''

আমাকে সর্বভূতে বিবরাজমান জেনে মৈত্রী ও অভিন্ন বোধে দান মান দিয়ে পূজা কর। ঐ যে ঠাকুর বলেছিলেন, দয়া কি রে, সেবা । স্বামীজী বললেন, সেবাও নয়, পূজা । ভেদ বুদ্ধি না রেখে সকলকে পূজা করতে হবে, স্বামীজী এইটে শেখাতে চেয়েছিলেন । স্বামীজী নিজে সমস্ত কথা একটি বাক্যে প্রকাশ করেছেন, "My ideal indeed can be put into a few words and that is: to preach unto mankind their divinity, and how to make it manifest in every movement of life." -- আমার সমস্ত শিক্ষা সামান্য কয়েকটি কথায় প্রকাশ করা যায় এবং তা হচ্ছে, প্রত্যেককে বুঝিয়ে দেওয়া যে, তার মধ্যে ঈশ্বর আছেন, ব্রহ্ম আছেন ; আর তার প্রত্যেকটি চলায় বলায় ব্যবহারে আচরণে সেই ব্রহ্ম ভাবটি যাতে প্রকাশিত হয়, তার উপায় বলে দেওয়া । এই তো স্বামীজীর শিক্ষা । আর এই যেসব সমাজসেবা হচ্ছে, সেগুলো by-products, এই করতে গিয়ে আপনই এগুলো এসে পড়ে ।

এই যে সব international philanthropic service organisations আছে, সেগুলো কি কয়জন অবতার পুরুষকে এসে আরম্ভ করতে হয়েছিল ? আর এই ঠাকুরকে আসতে হল শুধু আর একটি philanthropic service organisation হবে বলে ? আহাম্মকি বুদ্ধি ! এঁরা এসেছিলেন, কারণ মানুষ নিজেকে ভুলে গিয়েছিল, তার সত্তাকে ভুলে গিয়েছিল । জগতে অনেক অবতার বা অবতারকল্প পুরুষ এসেছেন, যেমন অন্য দেশে যীশু, মহম্মদ এসেছেন, আমাদের দেশে অনেকে এসেছেন । কিন্তু সেটা হচ্ছে, এক এক দেশে এক এক সময়ে একটি একটি গোষ্ঠীর মধ্যে যখন ধর্মের পতন হয়েছে, অধর্মের উত্থান হয়েছে, সেটিকে বাঁচাবার জন্য । আর ঠাকুর যখন এসেছিলেন, তখন পৃথিবী-জোড়া যত ধর্ম আছে, সব ধর্ম অধঃপতিত হয়েছে, আর পৃথিবী জুড়ে অধর্মের উত্থান হয়েছে । সেইটিকে বাঁচাবার জন্য এসেছিলেন, শুধু হিন্দু ধর্মকে বাঁচাবার জন্য নয়, শুধু ভারতবর্ষকে বাঁচাবার জন্য নয়, সমস্ত ধর্মকে বাঁচাবার জন্য । সেজন্যই তিনি তিনি অবতারবরিষ্ঠ। আর সৃষ্টির আদিকাল থেকে সেই যে ব্রহ্মর্ষিরা সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে ছিলেন, সেইখান থেকে স্বামীজীকে নিয়ে এসেছিলেন ঠাকুর, তিনি জগতে এই নতুন সমাচার দেবেন বলে । আমরা যেন নিজেদের জীবনকে তাঁদের শিক্ষা অনুসারে চালাবার চেষ্টা করে ধন্য হতে পারি ।